অনুগল্প চল্লিশ

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

॥ সূচি ॥

ফ্যানলিস্ট	৯
ক্ষতিপূরণ	১১
আদর্শ প্রেম	১৩
জানা আঙ্কেল	১৫
পিকনিক	১৭
পরম্পরা	১৯
লক্ষ্যভেদ	২১
ইতি স্বপ্না	২৩
মোহনা	২৫
এস.এম.এস	২৭
শুভ পরিণয়	২৯
রম্যাণি	৩০
ভরসা	৩২
মা	৩৫
একরাতের রাজারানী	৩৭
অগ্নি	৪০

লেডিজ কম্পার্টমেন্ট	৪৩
পণবন্দি	৪৬
মুজরিম	৪৭
যে প্রেম	৪৯
মাতৃত্ব	৫১
পত্রাঘাত	৫৩
প্রতিবন্ধ	৫৫
সিবিআই	৫৭
একা	৫৯
পার্টনারশিপ	৬২
ট্রমা	৬৫
স্বীকারোক্তি	৬৭
ভিডিও-কল	৬৯
প্রাইভেট টিউশন	৭৩
রাঙামেসো	৭৫
সম্পর্ক	৭৭
লীলাবতী	৭৯
উচ্চাকাঙ্ক্ষা	৮১
সোমনাথ সামন্ত	৮৩
একটি বইমেলা	৮৬
সময়	৮৮
মুখোমুখি	৯০
সুরক্ষা	৯২
নামকরণ	৯৫

॥ ফ্যানলিস্ট ॥

অশোকদা একজন জাঁদরেল ডাকাবুকো স্বভাবের মানুষ। সোজাকে সোজা এবং বাঁকাকে বাঁকা বলতে ভয় পান না। কোনোরকম আদিখ্যেতা বা ন্যাকামি বরদাস্ত করেন না। এইসব কারণেই আমি তাঁর অনেক ফ্যানদের অন্যতম। ওঁর কম্পানি আমি খুব এনজয় করি বলে কমন জায়গায় নেমন্তন্ন থাকলে আমরা মোটামুটি একসঙ্গে যাওয়া-আসা করি। সেদিনও একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা একসাথে গেছিলাম। ফেরার পথে একটা ফোন এল অশোকদার। উনি বললেন, কি রে সব খবর ঠিক আছে তো? বুকুন আর কান্নাকাটি করেনি তো! একটু বোঝার চেষ্টা কর—ওর কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা। সেরকম বুঝলে একদাগ আর্নিকা খাইয়ে দে। ওইতো আমার ড্রয়ারে আছে দ্যাখ।—কিরে পেলি! পাসনি! ঠিক আছে। আমি আর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছুব। ততক্ষণ ওকে সামলে রাখিস। কিছু খাওয়াতে পেরেছিস? কি বললি—মুখে তুলছে না কিছু! এতো চিন্তার ব্যাপার। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি আসছি। এখন রাখছি। অশোকদাকে চিন্তান্বিত দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে অশোকদা! কোনো বিপদ! মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে?

অশোকদা বললেন, হ্যাঁ, ঝুমকির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বুকুনটার শরীর ঠিক নেই। একটা সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বেচারা....তোর বৌদিও নেই বাড়িতে। অফিসের কাজে বাইরে। কি ধঞ্চাট বল দেখি!

বললাম, বুকুন কে! কোনো আত্মীয়!

অশোকদা অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিল, না না আমাদের বাড়িতে আশ্রিত। ওই ঝুমকি ওকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু দুদিনেই ও আমাদের এত আপনজন হয়ে উঠল, এখন ওকে ছাড়া থাকার কথা ভাবতেই পারিনা।

বললাম, বাঃ ঝুমকির তো বেশ মানবতাবোধ জন্মেছে। শুনে খুব ভালো লাগছে। সেই ছোটো থেকে দেখছি তো ওকে। তা ওকে পেল কোথায় ঝুমকি?

ওইতো আমাদের বাড়ির রাস্তায় ঢোকার মুখে। ও তখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছে। করুণ সুরে কাঁদতে কাঁদতে ওর পেছন পেছন আসছিল বুকুন। ঝুমকির এত মায়া হয়েছে যে ফেলে আসতে পারেনি। কোলে নিয়ে সোজা বাড়ি এনে হাজির করেছে। তোর বৌদি বিরক্তি প্রকাশ করাতে ঝুমকি বলেছে, তুমিও

এরকম করছো! ওকে একটু আশ্রয় দিতে পারবে না? ও ছেলে হলে রাস্তায় পড়ে থাকত না মা, মেয়ে বলেই ফেলে দিয়েছে বুঝতে পারছো না!

ব্যস, বুকুন থেকে গেল বহাল তবিয়েতে। হেসে বললাম, বাব্বা! ঝুমকি তো বেশ নারীবাদী হয়ে উঠেছে দেখছি! তা তোমরা কি একে দত্তক নেবে ঠিক করেছ নাকি!

অশোকদা বিস্মিত হয়ে বললেন, দত্তক! কেন, কুকুরকে দত্তক নিতে হয় নাকি?

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। বুকুন যে কুকুর হতে পারে অশোকদার কথাবার্তায় মোটেই বোঝা যায়নি। একটা ভাবনা শুধু মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করল—অশোকদার ফ্যানলিস্ট থেকে একটা নাম কি কাটা গেল!!

॥ ক্ষতিপূরণ ॥

জোয়ান মরদ কালীডোম হঠাৎ সাপের কামড়ে যখন মারা যায়, তার একবছরের বিয়ে করা বৌ ময়না তখন ছ-মাসের গর্ভবতী। শাশুড়ি তখনো বেঁচে ছিল বলে ময়নাকে চোখে অন্ধকার দেখতে হলো না। গরীব খেতমজুর কালীর মা এমনিতেও এবাড়ি-ওবাড়ি পাট-ঝাঁট করতো। কালীর অকালমৃত্যুতে ভেঙে পড়লেও তার অনাগত সন্তান আর স্ত্রীর কথা ভেবে নিজের মনকে শক্ত করে আরো বেশিবেশি কাজ ধরলো কালীর মা। নাতি কৃষ্ণর জন্মের পর ময়নাও ধীরে ধীরে কাজে যাওয়া শুরু করলো। কিন্তু অপুষ্টি আর অতি পরিশ্রমে কালীর মায়ের শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়লো। এমনি করে কৃষ্ণর যখন দশ, কালীর মা মারা গেল। কৃষ্ণ তখন গাঁয়ের পাঠশালা ছেড়ে দু-ক্রোশ দূরের বড় ইস্কুলে পড়তে যায়। ময়নার খুব ইচ্ছা ছিল ছেলে অনেক লেখাপড়া করে মানুষ হবে। কিন্তু ক্লাস নাইনে পরপর তিনবার ফেল করার পরে ছেলেকে পড়ানোর ধৈর্য এবং ক্ষমতা দুটোই হারিয়ে ফেলল ময়না। সমস্যা হলো স্কুলছুট কৃষ্ণ খেতের কাজেও মন বসাতে পারলো না। রাতদিন মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি লাগে। গাঁয়ের প্রধান গোবিন্দ মন্ডল একদিন ময়নাকে বলল, ময়না, তোর ছেলের যা মতিগতি দেখচি, গাঁয়ে থেকে ও কিছু করতে পারবে না। ওকে বরং লরিতে কাজ করতে লাগিয়ে দে। প্রথমে খালাসির কাজ করতে করতে লরি চালানো শিখে নেবে। তারপর ড্রাইভার হয়ে গেলে তো চিন্তা থাকবে না। আমার ভগ্নীপতি যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে চাকরি করে, ওরা কিছু খালাসি লাগাবে এখন। তোরা রাজি থাকলে বলে কয়ে পাঠিয়ে দোব।

ময়না বলল, আপনি আজই বলে দিন বাবু। কৃষ্ণ যাবে।

খালাসি থেকে ড্রাইভার হতে বেশি সময় লাগল না কৃষ্ণর। এরমধ্যে পাশের গাঁয়ের মধু মাঝির মেয়ে টিকলির সঙ্গে ভালোবাসাবাসি শুরু হয়েছে। ছুটিছাটায় বাড়ি এলে মায়ের চেয়ে টিকলির সঙ্গেই বেশিক্ষণ থাকে কৃষ্ণ। ভাবগতিক দেখে ময়না তড়িঘড়ি বিয়ে দিল ছেলের। বছর না ঘুরতেই টিকলির কোলে এল নাতনি ইচ্ছা। ময়নার ভাঙাঘর আবার ভরে উঠল।

কৃষ্ণর সাধ মেয়ের প্রথম জন্মদিনে বেশ ধুমধাম করে লোকজন খাওয়ানো হবে। বাড়ি আসার সময় কলকাতা থেকে জন্মদিনের কেক আর মিষ্টি নিয়ে আসবে কৃষ্ণ। ময়না টিকলি দুজনেই খুব ব্যস্ত। ইচ্ছা নতুন জামা পরে টলমল

পায়ে উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সকালে ডিউটি শেষ করে বাস ধরে বাড়ি আসার কথা কৃষ্ণর। দুপুর গড়িয়ে বিকেলে খবর এল—লরি-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে কৃষ্ণ। ময়না জ্ঞান হারালো। টিকলি নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। ইচ্ছা কিছু না বুঝেই তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

কাজকর্ম মিটে যাবার পরে ময়না টিকলিকে বলল, বৌমা, তুমি কদিন বাপের বাড়ি ঘুরে এস। এইসময় মায়ের কাছে থাকলে একটু ভালো লাগবে।

টিকলি বলল, না মা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবোনা। আমাকে যেতে বলোনা। শাড়ির খুঁটে চোখ মুছল ময়না।

কদিন পরে গোবিন্দ মন্ডল বলল, কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে খুব শিগগিরি। যা ক্ষতি হয়েছে তা তো কোনোদিন পূরণ হবার নয়। তবে তোমাদের তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে। মনে হয় ভালো টাকাই দেবে। ক্ষতিপূরণ ধার্য হল তিন লাখ টাকা। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে কৃষ্ণর মাকে দেওযা হলো এক লাখ। কৃষ্ণর বৌকে দেওয়া হলো এক লাখ। আর ইচ্ছার জন্য এক লাখ। যতদিন ইচ্ছা নাবালিকা থাকবে ততদিন পর্যন্ত ওই টাকা রাখা থাকবে ওর মা অর্থাৎ টিকলির হেফাজতে।

দু-সপ্তাহের মাথায় হঠাৎ একদিন শাশুড়িকে না জানিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেল টিকলি। ময়না একেবারে একা হয়ে গেল।

দু-মাসের মাথায় শোনা গেল টিকলি বিয়ে করেছে ওই গাঁয়ের প্রধানের ছেলে শিবু মাঝিকে।

গোবিন্দ মন্ডল ময়নাকে বলল, ওই মেয়েটাই তোদের পরিবারে অভিশাপ হয়ে এসেছিল ময়না। আজ তোকে একটা কথা বলি। এতদিন বলিনি কারণ নিজেই বিশ্বাস করতে পারিনি। ও মেয়ে একদিন ঘর ছাড়তোই। আসলে কৃষ্ণ টের পেয়ে গেছিল টিকলি লুকিয়ে শিবুর সঙ্গে পীরিত করছে। আমার ভগ্নীপতি বলছিল, ইদানিং কৃষ্ণ নাকি খুব অন্যমনস্ক থাকত। ওটাই ওর কাল হলো। কিরকম বদ দ্যাখ মেয়েটা, ক্ষতিপূরণের টাকাটা পাবার পরেই নিজমূর্তি ধারণ করলো।

ময়না পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ বসে রইল।

॥ আদর্শ প্রেম ॥

পেশায় সাংবাদিক হওয়ায় হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে কিছু ফিল্ম দেখা হয়ে যায় কাগজে রিভিউ লেখার সুবাদে। গতকালও সেই উদ্দেশ্যে ইভনিং-শোতে ঢুকে পড়লাম 'প্রিয়া'য়। আমি যখন হলে ঢুকি তখন হল অন্ধকার। ফিল্ম সবে শুরু হয়েছে। হিন্দী ছবি—ঘণ্টাতিনেকের শো। দেড়ঘণ্টার মাথায় ইন্টারভ্যাল হলো। হলের আলো জ্বলে উঠল। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছি যদি কোনো চেনামুখ পাওয়া যায়। আমার দু-তিন রো সামনে কোণাকুণি সিটে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, ঠিক দেখছি তো!

ছোটোবেলা থেকে আমি যাদের জেঠু-জেঠিমা বলে জানি, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। বাবা আর জেঠু দুজনেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইকোনমিকস্-এর ছাত্র। একবছরের ছোটো-বড়ো। জেঠুমাও যাদবপুরে ইংরেজি নিয়ে পড়াশুনো করেছে। ছাত্রজীবনেই প্রেম জেঠু-জেঠুমার। ওদের প্রেম একটা 'আদর্শ প্রেম' হিসেবে আলোচিত সেইসময় থেকে শুরু করে আজও। এসব কথা কেউ আমাকে আলাদা করে বলেনি। ওদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের এতটাই ঘনিষ্ঠতা যে নানাভাবে জেনে গেছি। ওদের একমাত্র মেয়ে সুকন্যাদিকে আমি দিদি বলে শুধু ডাকি তা নয়, নিজের দিদিই মনে করি। বিয়ের পরে ও আমেরিকায় চলে গেছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু একটুও কমেনি। রাত নেই দিন নেই যখন-তখন টেলিফোনে কথা বলি, হোয়াটস অ্যাপে ভিডিও-কল করি, প্রয়োজনে ই-মেল আদান-প্রদানও চলে।

না, কোনো ভুল নেই। আমার বাবাই। পাশে জেঠুমা। জেঠুকে সারা হলে কোথাও দেখতে পেলাম না। কাছাকাছি মাথা এনে দুজনে হেসেহেসে যেভাবে কথা বলছে—মনে হচ্ছে উঠতি বয়সের প্রেমিক-প্রেমিকা। ইন্টারভ্যাল শেষ। হলের আলো নিবে গেল। শো শুরু হয়ে গেল। আমার মনের ভেতরে তখন সাংঘাতিক অস্থিরতা! ফিল্মে মন লাগাতে পারছি না। এতদিনের সমস্ত ভাবনা যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম হল থেকে বেরিয়ে যাই। তারপরে ভাবলাম এটুকু দেখেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। শেষপর্যন্ত দেখা যাক কি হয়!